



ডায়ালগ প্রতিবেদন-এক

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি

কীভাবে বাণিজ্যিকীকরণ থেকে জীববৈচিত্র্য
নির্ভর কৃষিতে প্রত্যাবর্তন করা যাবে

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

RESEARCH
INITIATIVES
BANGLADESH



ডায়ালগ প্রতিবেদন-এক

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি

কীভাবে বাণিজ্যিকীকরণ থেকে জীববৈচিত্র্য
নির্ভর কৃষিতে প্রত্যাবর্তন করা যাবে

সম্পাদনা

সুরাইয়া বেগম

সাইদুর রহমান

মোঃ ইফতেখার আলী

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি:
কীভাবে বাণিজ্যিকীকরণ থেকে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিতে
প্রত্যাবর্তন করা যাবে

**Climate Change and Agriculture in
Bangladesh: How to return from commercial-
ization to agricultural biodiversity**

সম্পাদনায়
সুরাইয়া বেগম, সাইদুর রহমান, ও মোঃ ইফতেখার আলী

Edited by
Suraiya Begum, Saidur Rahman, and Md. Iftekhar Ali

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৮

Published in
October, 2018

প্রকাশনায়
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব)
বাড়ি ০৭, (কাজলী) সড়ক ১৭, ব্লক সি, বনানী
ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮০-২) ৯৮২০০৫১-২
ইমেইল: rib@citech-bd.com
ওয়েব: www.rib-bangladesh.org/

Published by
Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 07, (Kajoli) Road 17, Block C, Banani,
Dhaka-1213, Bangladesh
Phone: (+ 880-2) 9820051-2
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org/

সহায়তায়
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং
ফ্রাঞ্জ-মেহরিং-প্লাটজ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.de
www.rosalux-southasia.org

Supported by
Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www.rosalux.de
Web: www.rosalux-southasia.org

মুদ্রণে
ইউনিট্রেড কর্পোরেশন
মুক্তবাংলা শপিং কমপ্লেক্স
মিরপুর-১, ঢাকা

Printed by
Unitrade Corporation
Mukto Bangla Shopping Complex
8th Floor, Mirpur-1, Dhaka, Bangladesh

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung e.V with funds of the Federal Ministry for
Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany.

মুখবন্ধ	০৫
ভূমিকা	০৭
সভাপতির বক্তব্য	০৭
সূচনা বক্তব্য	০৮
মূল প্রবন্ধ	০৮
মুক্ত আলোচনা	১২
১. কেবল নিবিড় চাষ নয়, মাটির স্বাস্থ্য আর নিরাপদ খাদ্যের দিকে নজর দরকার	১২
২. স্থানীয় জাত ও জ্ঞান ধরে রাখতে আমাদের মানসিকতা পাল্টাতে হবে	১৩
৩. মাটিতে জৈব কার্বনের পরিমাণ বাড়াতে হবে	১৪
৪. কেবল মাংসের চিন্তা না, মান সম্পন্ন মাংস ও পুষ্টির নিশ্চয়তা দরকার	১৪
৫. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগ	১৫
৬. শস্যের বৈচিত্র্য না থাকলে জীববৈচিত্র্য থাকবে কি?	১৭
৭. মাটির উন্নয়নে কয়লার ব্যবহার	১৭
৮. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিতে ফেরা যাবে কি?	১৯
পূর্বের অভিজ্ঞতা	২০
সংলাপের সমাপনী	২২

মুখবন্ধ



আমাদের কৃষক হাজার বছর ধরে শ্রম দিয়ে নানা ধরনের খাদ্যশস্য উৎপাদন করে আসছেন এবং যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে দক্ষ ফসল উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। আমরা জানি, মানুষের জীবনধারণ প্রতিবেশ ব্যবস্থা তথা জীববৈচিত্র্য, জলাধার, ও বনাঞ্চল প্রভৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হাজারো প্রকারের প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক আমাদের প্রতিবেশ ব্যবস্থায় বিদ্যমান। এর কোন একটা স্তরে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিলে তার প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হবে সেটা সহজে নিরূপণ করা যায় না। শত শত বছর ধরে কৃষকরা, প্রতিবেশ ব্যবস্থার নিরীখে ফসল ও তার জাত নির্বাচন, চাষপদ্ধতি, সেচপদ্ধতি, ফসল উত্তোলন, বীজ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং আকস্মিক দুর্যোগ ও নানা উপায়ে তারা মোকাবেলা করে আসছেন।

এতসব সত্ত্বেও আমরা কি কৃষকের জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সঠিক কদর করি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কৃষকের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিপরীতে অধিক উৎপাদন-সহায়ক কৃষিপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে সেসব তথাকথিত বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও কৃষি প্রতিবেশ যে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে-পানি দূষিত হয়েছে, মাটি নষ্ট হয়েছে, এবং খাদ্যে বিষক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তা সবাই স্বীকার করবেন। যদিও সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে, তবুও ক্ষুধা-অপুষ্টি কমেনি। খাদ্যের মান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। অর্থাৎ, উন্নয়ন স্থায়ী ও সুস্থ হচ্ছে না। বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে, বাজার ও কর্পোরেশন জনগণের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ চিন্তা করছে না।

বিভিন্ন দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এতে পরিবেশের উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন কৃষিকে যখন নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে, তখন দেখা যাচ্ছে, এই পরিবর্তনের সূত্রধরে বিভিন্ন মহল কৃষি ও প্রকৃতিকে ঘিরে নতুন নতুন ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ুর পরিবর্তনে উন্নত বিশ্বের শিল্পকারখানা থেকে উদ্গত গ্রিনহাউজ গ্যাস বিশেষভাবে দায়ী, অথচ তার খেসারত দিতে হচ্ছে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে।

পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রেক্ষিতে কৃষিব্যবস্থাকে উপযুক্ত ও শক্তিশালী রাখতে সরকার, গবেষক ও কৃষকদের সমন্বিতভাবে কাজ করা দরকার। এক্ষেত্রে স্থানীয় থেকে বৈশ্বিক, সর্বস্তরে জলবায়ুসহিষ্ণু কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যদিও জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ফসলী জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে অধিক ফসল উৎপাদন যুগের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও আমাদের মনে রাখা দরকার যে অধিক ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া ঠিক হবে না, যাতে প্রতিবেশ ব্যবস্থা, তথা প্রকৃতির ভারসাম্য, হুমকির মধ্যে পড়ে এবং প্রকারণে মানুষের জীবনধারণও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই সাথে, কৃষির নিয়ন্ত্রণ যাতে উৎপাদক কৃষকের হাতেই থাকে, সে ব্যাপারে আমাদের তৎপর থাকতে হবে।

রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-জার্মানি'র সহযোগিতায় “জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি” বিষয়ক যে ডায়ালগের আয়োজন করা হয়েছিল তার মাধ্যমে কৃষি, কৃষক ও প্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিনিময় হয়েছে। কৃষি ও কৃষকের জন্যে কিভাবে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি প্রণয়ন করা যায় সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উদ্যোগী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ তাদের সুচিন্তিত মতামত ও সুপারিশ দিয়েছেন। এর ফলস্বরূপ আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং কৃষক ও কৃষিপ্রতিবেশ নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে উদ্যম বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের যুক্তি-তর্ক ও পরামর্শ আমাদের করণীয় নির্ধারণকে সহজ করেছে।

সর্বশেষে বলতে হয়, আমরা যে কৃষি ও মাটিকে চিনতাম সেগুলোর ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। চাহিদা, প্রযুক্তি ও নানামুখী স্বার্থ এসব পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তবে, কিছু কিছু পরিবর্তন যে স্বাস্থ্যকর নয় সে ব্যাপারে অনেক মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছি। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের প্রিয় পরিবেশ ও প্রকৃতিকে বাঁচাতে হবে।

ড. শামসুল বারি

চেয়ারম্যান

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)



সংলাপে সভাপতিত্ব করেন রিইব-এর চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি

বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছে। রিইব ২০১২ সন থেকে কৃষি প্রশ্ন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি ব্যবহার এবং বর্তমানে “প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা ২০১৮” (Agro-ecology from Below: Pedagogy and Participatory Action (2018) নামে একটি কৃষিকেন্দ্রিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ, মাটি-পানি-জীবন তথা জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, এবং স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিয়ে আলোচনা-পরামর্শ ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং জ্ঞানচর্চা করা হয়। প্রকল্পের সম্প্রসারিত কর্মকাণ্ড হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি নিয়ে ২০১৭ সনের আগস্ট মাসে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়, যেখানে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞগণ জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিতে তার প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে নানান মহলের চিন্তা ও নীতি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থ, এবং কৃষি ও কৃষকের ভবিষ্যত নিয়ে সুচিন্তিত মতামত দেন ও তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন। উক্ত সেমিনারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে প্রাথমিকভাবে জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও জরুরী বিধায় এ বছরের জুলাই মাসে কৃষি, জলবায়ু, পানি, ভূমি, বন, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে “জলবায়ুর পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি” শীর্ষক এই সংলাপের আয়োজন করা হয়। এই সংলাপে কৃষির চিরায়ত বৈশিষ্ট্য, জলবায়ুর পরিবর্তন ও অভিযোজন, প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষায় আমাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

সভাপতির বক্তব্য

সংলাপের সূচনা করেন রিইব-এর চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি। তিনি বলেন, আমরা যে কৃষি ও মাটিকে চিনতাম সেগুলোর ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। প্রযুক্তি এসব পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তবে, কিছু কিছু পরিবর্তন স্বাস্থ্যকর নয়। এ ব্যাপারে অনেক মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রিয় পরিবেশ ও প্রকৃতিকে বাঁচাতে হবে।

সূচনা বক্তব্য

সংলাপের শুরুতে সূচনা বক্তৃতায় রিইব-এর উপ-পরিচালক সুরাইয়া বেগম বলেন, রিইব এর কাজের মূল জায়গা হলো, জ্ঞানের চর্চা ও প্রসার। জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি (Agro-ecology) নিয়ে রিইব ২০১৩ সন থেকে যে প্রকল্প শুরু করেছে তার লক্ষ্য, কৃষি জীববৈচিত্র্য বাড়ানো কারণ খরা, বন্যা, লবণাক্ততা, ইত্যাদি ক্রমশই অধিকহারে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে আক্রান্ত করেছে। কৃষিতে যে বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে তাতে কৃষকরা বেশি প্রভাবিত হচ্ছেন, কারণ তারা কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন সেটি অনেক সময় বুঝতে পারেন না। এসব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও তথ্য-উপাত্ত তৈরিতে রিইব কাজ করেছে। এই কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে জার্মানির ‘রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং’ প্রতিষ্ঠান।



সুরাইয়া বেগম

রিইব চায়, চাষাবাদের ক্ষেত্রে কৃষকরা যাতে জৈব-অজৈব কৃষির তুলনামূলক চিত্র সামনে রেখে সচেতনভাবে তাদের বীজ, জাত ও উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের রূপ, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ, কৃষিতে তার প্রভাব এবং উক্ত প্রভাব মোকাবেলায় কৃষকরা কোন পদ্ধতিকে বেছে নেবেন সেরকম জ্ঞান সৃষ্টিও রিইব-এর কাজের লক্ষ্য। এই সংলাপ থেকে যেসব দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে সেগুলো প্রকল্পের আউটপুট হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড সেই লক্ষ্যে পরিচালিত হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি

বাংলাদেশের কৃষি, জলবায়ু, পানি ও মাটি সংক্রান্ত নীতিপদ্ধতি প্রণয়ন ও সংস্কার কাজে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন, জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি ও দাতাসংস্থা প্রমুখের সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়। এসব নীতিপদ্ধতি ও সংস্কারের ক্ষেত্রে বাজারমুখী লক্ষ্যগুলো, যেমন, দক্ষতা, উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি, ভোগ ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্ব পায়। কৃষি, পরিবেশ, পানি ও ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, আমরা প্রকৃতির সংরক্ষণকে পেছনে ফেলে বাণিজ্যিকীকরণ ও ভোগবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছি। ফলশ্রুতিতে, মনোকালচার প্রসার পাচ্ছে, খাদ্যের মান হ্রাস পাচ্ছে, জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হচ্ছে, স্থানীয় জ্ঞানের পরিবর্তে ধার করা বুদ্ধির প্রভাব বাড়ছে, এবং বীজ ও জাত সংরক্ষণ লোপ পাচ্ছে।

কৃষির প্রাকৃতিক রূপ ও তার বিপরীতে নানাবিধ সংকট

কৃষি প্রাকৃতিকভাবেই ধীর ও ঘাতসহ হয়ে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নানান বিবর্তন আগেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে। দেশে দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যুক্ত



মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক সাইদুর রহমান

হয় নানাবিধ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, যেগুলো অনেক সময় সুচিন্তিত ও যথাযথ হয় না; বরং সেগুলোর প্রভাবে প্রাকৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক ক্ষতি আরও বাড়তে থাকে। কৃষিকে ক্লাইমেট স্মার্ট করতে গিয়ে দেশে দেশে বাণিজ্যিক কৃষির পক্ষে ভূমি-অধিগ্রহণ, হাইব্রিড ও জিএম শস্যের বিস্তার, ও বিষাক্ত দ্রব্যের প্রয়োগ বাড়ছে। এতে কৃষিতে বড় বড় কোম্পানির (ইয়ারা, সিনজেন্টা, ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতির) অনুপ্রবেশ বাড়ছে, এবং এসব কোম্পানি কৃষি ও গবেষণা অ্যালায়েন্স গড়ে তুলছে। আবার কৃষিকে জলবায়ুসহিষ্ণু করার নামে প্রাকৃতিক

কৃষিপদ্ধতিগুলোকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করা হচ্ছে। সিএসএ'র আওতায় কনজারভেশন এগ্রিকালচারের নামে প্রচুর আগাছানাশক ছড়ানো হচ্ছে; শস্যকে খরা, বন্যা, ও লবণ সহিষ্ণু করার নামে জিএম শস্য আনা হচ্ছে; পশুসম্পদের প্রসারের নামে প্রক্রিয়াকরণ, মোটাতাজাকরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থাকে মৌলিক বিবেচনা করা হচ্ছে; প্রযুক্তি বলতে বেশি বেশি যান্ত্রিকীকরণ করা হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, কৃষিতে যত গবেষণা, কৌশল ও প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা ও অপুষ্টি কমেনি।

প্রশ্ন থাকে, তাহলে বেশি উৎপাদনের ফল কোথায় যাচ্ছে? উচ্চহারে সিনথেটিক সার আর কীটনাশক প্রয়োগ করে উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের ফসল ফলানো হচ্ছে বটে; কিন্তু এগুলোর কী প্রভাব পড়ছে, আর আমাদের ভবিষ্যতই বা কেমন হবে? জলবায়ুর সংকটের ফলে কারা লাভবান হবেন, আর কারাই বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন?

কৃষি ও পরিবেশ আন্দোলন কর্মী সৌমিত্র ঘোষ রাসায়নিক নির্ভর কৃষির ফলে তিন ধরনের ক্ষতির কথা বলেছেন- “জীববৈচিত্র্য নাশ, জলবায়ুর পরিবর্তন ও নাইট্রোজেন চক্রের ক্ষয়-যেগুলোর হিসেবনিকেশ আগে করা হয়নি।”^১ একই অনুষ্ঠানে কৃষি গবেষক ড. নিলুফার হাই করিম বলেন, “বর্তমান ধারার কৃষি কর্পোরেশন নির্ভর, মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্যে অনিরাপদ, মাটির বৈশিষ্ট্য ধ্বংসকারী, উপকারী পতঙ্গ ও অনুজীব ধ্বংসকারী; এবং এর ফলে বাস্তুতন্ত্র অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে, দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে, এবং অজানা সব রোগে মানুষের মৃত্যু বাড়ছে।” আমেরিকান জার্নাল অব ট্রপিকেল মেডিসিন প্রকাশ করেছে, শক্তিশালী কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক (এন্ডোসালফান) ২০১২ সনে বাংলাদেশের ১৩টি শিশুর মৃত্যুর কারণ।^২ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ২০১৫ সনে এই উপাদানটি নিষিদ্ধ করার পক্ষে অবস্থান নিলেও যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে যায়।

1. Presented in international conference on “Financialisation and False Solutions: Climate smart agriculture and its alternatives”, 9-11 August 2017, Dhaka, organized by Research Initiatives, Bangladesh & Rosa Luxemburg Stiftung.

2. Islam, M. S., Sharif, A. R., Sazzad, H. M., Khan, A. D., Hasan, M., Akter, S., ... & Gurley, E. S. (2017). Outbreak of sudden death with acute encephalitis syndrome among children associated with exposure to Lychee Orchards in Northern Bangladesh, 2012. The American journal of tropical medicine and hygiene, 97(3), 949-957.

কৃষি গবেষক রঘুনন্দন কৃষির সংকটের সাথে নব্য-উদারতাবাদের সম্পর্ক দেখিয়েছেন, যে কারণে কৃষি ইনপুটের দাম বেশি, সরকারি বিনিয়োগ কম, বিশ্ব বাজারে অস্থিতিশীলতা, মধ্যস্থত্বভোগীর প্রভাব, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব, রাসায়নিকের প্রভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটি ক্ষয়, কীটের প্রসার, অবকাঠামোর অভাব, পল্লী অর্থনীতির মন্দা, অকৃষি খাতের প্রসার, পশুসম্পদের কমতি, ফসলের ধারাপতন, খাদ্য নিরাপত্তার অভাব ও নীতি গ্রহণে ধীরগতি দেখা যায়। জলবায়ু ও কৃষি বিষয়ক গবেষক সৌম্য দত্ত স্থানীয় প্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে আমদানিকৃত জলবায়ুসহিষ্ণু পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন, কেন্দ্রীভূত কোন জাদুকরী সমাধান স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের জন্যে উপকারী নয়; বরং তারা না বুঝেই অনেক সময় এগুলো প্রয়োগ করে থাকে। বস্তুত, কৃষির চেয়ে বাজার ব্যবস্থার দিকে নজর রেখেই এরকম অনেক সমাধান দেওয়া হয়।

জলবায়ু, অভিযোজন ও বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন বোঝা যাবে এখানকার গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের ধরন ও সময় পরিবর্তন, পানির স্তরহ্রাস, জলরাশির হ্রাস, খরা ও বন্যার মত দুর্যোগ বৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। ড. আতিক রহমান জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে জড়িত ১২টি প্রভাবের উল্লেখ করেছেন- সমুদ্রের উচ্চতাবৃদ্ধি, অধিক ও শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততার প্রবেশ, অপ্রত্যাশিত বৃষ্টিপাত, অধিক ও ব্যাপক বন্যা, খরা, নদীতীরে ক্ষয়, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, খাদ্য অনিরাপত্তা, পানির অনিরাপত্তা, ভূমিধ্বস, ও অভিবাসন। সারকথা হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের প্রতিবেশ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। কৃষি গবেষক ড. মো. মোস্তফা কামাল বলেন, এগুলো আমাদের কৃষি, পশুসম্পদ ও মৎস্য সম্পদকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সৌমিত্র ঘোষ বলেন, যেহেতু জলবায়ুর পরিবর্তনকে সরাসরি রোধ করা যাবে না; কাজেই, আমাদের উৎপাদন পদ্ধতিকে ইতিবাচকভাবে পাLETTE নিতে হবে। জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসের জন্যে বাজারসৃষ্টি সমাধান যেমন, সেচ, ঘাতসহনশীল বীজ, সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, কৃষিশিল্প ও কৃষিবাণিজ্য, এসবের উপর নির্ভর করলে চলবে না।

বাংলাদেশে জলবায়ুসহিষ্ণু নানান প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, এবং জলবায়ু সহিষ্ণু কিছু জাতও উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে, এসবের মূল লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি। সেখানে মাটির স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ব্যবস্থা ইত্যাদি দিকগুলো গৌণ হয়ে পড়েছে। অন্যান্য শিল্পের সাথে সাথে বৃহদাকার সার ও কীটনাশক কোম্পানি-কারখানাগুলোও একদিকে বায়ুদূষণ, পরিবেশ দূষণ তথা জলবায়ুকে উত্তপ্ত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার নীতি-পদ্ধতি নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে প্রেসক্রিপশন-পরামর্শ দেয়।

জীববৈচিত্র্য বিষয়ক গবেষক পাভেল পার্থ বলেন, স্থানীয় ফসলের জাতগুলো নানান গুণসম্পন্ন, স্থানীয় প্রতিবেশের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ, জলবায়ুসহিষ্ণু, অধিক রোগপ্রতিরোধী ও সুস্বাদু হওয়ার পরও এগুলো প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। গত ডিসেম্বর ২০১৭ সনে কৃষিপ্রতিবেশ (এগ্রোইকোলোজি) সংক্রান্ত এক বৈঠকে বক্তারা বলেন, আমাদের ঐতিহ্যগত কৃষিপদ্ধতি হারিয়ে গেছে, যা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের পক্ষে সহায়ক ছিল। কৃষকরা এখন হতাশাজনকভাবে কর্পোরেট বীজ, সার ও কীটনাশকের উপর নির্ভরশীল হচ্ছে; যার ফলে,

জনগণের স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দুইই নষ্ট হচ্ছে। বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ে আমরা দেখছি, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠান কমবেশি ধোঁথ মডেল দ্বারা প্রভাবিত এবং তারা অনেকাংশে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কর্পোরেশনগুলোর তত্ত্ব ও নির্দেশনা মেনে চলছে। এতে, স্থানীয়জাত ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিরুদ্ধ ব্যবস্থা বেশি শক্তি পাচ্ছে। প্রকারান্তরে, জিএম, হাইব্রিড, মনোসেব জাতগুলো কি আমাদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জটিল কাঠামোকে ভেঙে ফেলছে না? এগুলো কি টেকসই উন্নয়নকে ব্যাহত করছে না?

আমাদের করণীয়

রাসায়নিক কৃষির ক্ষতিসমূহ টের পেয়ে দুনিয়ার অনেক সংস্থাই এখন প্রাকৃতিক কৃষি, পরিবেশবান্ধব কৃষি বা প্রতিবেশনির্ভর কৃষির দিকে ঝুঁকছে। এফওএ'র সূত্র ধরে ড. খুরশিদ আলম বলেন, অর্গানিক কৃষি (এক ধরনের প্রাকৃতিক কৃষি) একটা সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, যেটি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে, মাটির জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে, তথা সামগ্রিক প্রতিবেশের প্রতিই যত্নশীল। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. দেবল দেব বলেন, সত্যি বলতে, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান শিল্প বা বাজার থেকে আসা ঠিক না। এর সমাধানের জন্যে আমাদেরকে বর্তমান মুনাফা ও বাজারনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার বিপরীতে নিজস্ব খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে নগর-পল্লীর মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে, এবং যেখানে নগর-পল্লীর কৃষক, মৎস্যজীবী, পশুখামারীসহ সকলে প্রতিবেশের দিকে নজর রেখেই উৎপাদন করবেন।

আমরা অভিযোজনের পক্ষে যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছি সেগুলো টেকসই হতে হবে, যেখানে শস্য আবর্তন থাকবে, স্থানীয় ঐতিহ্যগত জাতের চাষ হবে, বীজের উপর কৃষকের অধিকার থাকবে ও প্রতিবেশ বাঁচবে। কৃষি, পানি, বন ও পরিবেশের ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নের সময় আমরা আরো বেশি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলতে পারি, সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থানীয় প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় আনতে পারি, এবং আমাদের ক্ষতিসমূহ নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্ক তুলে ধরতে পারি। সুখের কথা হলো, সম্প্রতি সরকার মাটির উর্বরতা হ্রাস, খাদ্যের নিরাপত্তা, পানির মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে, প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিচ্ছে, এবং সেসংক্রান্ত নীতিও (যেমন, জৈব কৃষি নীতি) প্রণয়ন করেছে।

রিইব উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবিমুখতা, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের সমূহ ঝুঁকি, এবং বাংলাদেশে মাটি ও প্রকৃতিতে দীর্ঘ মেয়াদী বিপর্যয়ের দিকগুলো বিবেচনা করে প্রতিবেশনির্ভর কৃষি (এগ্রোইকোলোজি) পুনরুত্থানের জন্যে কাজ করছে। রিইব মনে করে, মাঠ পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবেশগত কৃষির পক্ষে সমর্থন তৈরি হলে সরকারও সামগ্রিক সংরক্ষণমূলক কৃষির দিকে নজর দেবেন ও পরিবেশবান্ধব নীতি প্রণয়ন করবেন। আজকের অনুষ্ঠানের বিদগ্ধ আলোচকদের নিকট আমাদের প্রশ্ন থাকছে, বাংলাদেশের কৃষি, ভূমি, পানি, মৎস্য, ও পরিবেশ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে কী ধরনের নীতি গ্রহণ করা হলে খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সাথে এখানকার জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে বাঁচানো যাবে এবং সুস্থায়ী উন্নতি নিশ্চিত করা যাবে?

মুক্ত আলোচনা

কেবল নিবিড় চাষ নয়, মাটির স্বাস্থ্য আর নিরাপদ খাদ্যের দিকে নজর দরকার

মূল প্রবন্ধ পাঠশেষে উন্মুক্ত আলোচনার শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সাইন্সেস’-এর ফুড অ্যানালিসিস অ্যান্ড রিসার্চ ল্যাবরেটরি’র হেড প্রফেসর ড. লতিফুল বারী বলেন, এখন চাষাবাদে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ফসলের



ড. লতিফুল বারী

চেহারা সুন্দর ও ফলন বেশি হয়। কিন্তু এর ফলে ফসলে পানির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং পুষ্টি কমে যাচ্ছে। আবার মাটিতে জৈব উপাদানের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। যেখানে মাটিতে জৈব উপাদানের পরিমাণ অন্তত ৫ শতাংশ দরকার, সেখানে এখন ০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। জৈব চাষ এর চেয়ে অনেক ভাল। আমরা কৃষকদের অনুজীব বা জীবাণু সার ব্যবহার করতে বলছি। জীবাণু সার তৈরির পদ্ধতি হচ্ছে মাটি থেকে অনুজীব নিয়ে সেগুলোকে কালচার করে বাড়িয়ে আবার ঐ মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে বিদেশ থেকে বা অন্য এলাকা থেকে জীবাণু বা কেঁচো বা প্রাণী নিয়ে এসে দেওয়া যাবে না। কারণ অন্য এলাকার জীবাণু মাটিতে দিলে স্থানীয় জীবাণু বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালায় বাইরের প্রাণী ব্যবহারের অনুমতি নেই। কিন্তু ব্যবসার স্বার্থে এগুলো আনা হচ্ছে। আমাদের যেসব কর্তৃপক্ষ এসব নিয়ন্ত্রণ করেন, তারা এগুলো জানেন না। এজন্য আমরা তাদের সাথে বারবার কথা বলছি। আমাদের দেশকে ৩০টি কৃষি-প্রতিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এই ৩০ জায়গার জীববৈচিত্র্য ভিন্ন ধরনের। আমাদের এই কৃষি-প্রতিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে চাষ করতে হবে। জৈব সার বা জীবাণু সার ব্যবহার শুরু করলে উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কিছু সময় দিতে হবে। প্রথম বছরই ভাল ফল পাওয়া না যেতে পারে, তবে পরের বছর থেকে মাটির জৈব উপাদান বা জীবাণু বৃদ্ধির ফলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু কৃষকরা এগুলো করতে চাচ্ছেন না, তাদের অনেক রকম কাজ করতে হয়। তাই এখানে সরকারি ভর্তুকী ও স্থানীয় পর্যায়ে ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা দরকার। আমাদের নীতি-নির্ধারকদের এটা বুঝাতে হবে। বিশেষ করে বিদেশ বা অন্য এলাকা থেকে অনুজীব বা কেঁচো বা প্রাণী আমাদের মাটিতে দেওয়া যাবে না। কারণ এটা আমাদের মাটির জীবাণুর বা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এটা অনেকেই ভাবেনি, ফলে আমাদের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন রোগ-বালাই আসছে।

ড. মো. নাজিম উদ্দিন, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, বলেন, আমরা এই প্রজন্মের মানুষ আগামী প্রজন্মের মানুষের জন্য কিরকম পৃথিবী রেখে যাব তা এখন থেকেই ভাবা উচিত। সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ১৯৫০ এর দশকে ফসলের যে জাতগুলো ছিল সেগুলোর পুষ্টিগুণ আধুনিক জাতগুলোর চেয়ে বেশি, কোনটার ক্ষেত্রে প্রায় ২০০ শতাংশ। আমরা এখন খাচ্ছি ঠিকই কিন্তু পুষ্টি কমে যাচ্ছে। গত পঞ্চাশ বছরের চাষ



ড. মো. নাজিম উদ্দিন

ব্যবস্থা আমাদেরকে শিখিয়েছে গাছকে খাওয়াতে, কিন্তু জৈব কৃষি বলে মাটিকে খাওয়াতে। মাটি ভাল থাকলে গাছ ভাল থাকবে। আমাদের মাটি ভাল নেই, এজন্য আমরা জৈব কৃষি নিয়ে কাজ করছি। আমাদের ধানের অন্যতম মেগা জাত হচ্ছে ব্রি-২৯, যেটি আমরা জনপ্রিয় করেছি। কিন্তু এটির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অনেক বেশি (৭০+)। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) বেশি এমন খাবার খেলে রক্তে চিনি বা গ্লুকোজের পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যায়। এর ফলে ডায়াবেটিস ও মেদ (অবেসিটি)

এর প্রবণতা বেড়ে যায়। আমাদের দেশের ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই ব্রি-২৯ ধানের অবদান আছে, কারণ গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি এমন একটা জাতকে আমরা জনপ্রিয় করেছি। আবার এই ব্রি-২৯ কে ভিটামিন-এ ফর্টিফাইড করে গোল্ডেন রাইসে রূপান্তর করা হচ্ছে। সব পুষ্টি যদি ধানেই যোগ করা হয়, তাহলে তো অন্য ফসল চাষ আরও কমে যাবে। এমনিতেই আমাদের ধান চাষের ঝোঁক বেশি। অন্যদিকে বেশি দুধ উৎপাদনের জন্য আমাদের দেশী গরুকে হাইব্রীড করা হচ্ছে। কিন্তু ২০১২ সালের গবেষণায় দেখা গেছে ফ্রিজিয়ান গরুর দুধে বিটু কেজিন নামে একটা উপাদান থাকে, যার ফলে ঐ দুধ খেলে কোলেস্টরল বেড়ে যায়। মানুষ দুধ খায় উপকারের জন্য, অথচ কোলেস্টরল বেড়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের শুধু উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দিলে হবে না, খাদ্যের গুণগত মানের দিকেও অনেক মনোযোগী হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে বৈচিত্র্যপূর্ণ গুণগতমানসম্পন্ন পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন না করতে পারলে আমরা কর্মক্ষম জনসংখ্যার সুফল যেমন পাব না, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তিও তৈরি করতে পারব না।

স্থানীয় জাত ও জ্ঞান ধরে রাখতে আমাদের মানসিকতা পাল্টাতে হবে

ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), বলেন, পরমাণু শক্তি ধ্বংস ও সৃষ্টি উভয় কাজেই ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রায় ৪০ শতাংশ জমি কোন না কোনভাবে বন্যা কবলিত হয়ে যায়। এসব দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে বিনা গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন ফসলের দুর্যোগ সহনশীল জাত উদ্ভাবন করছে। নাজিরশাইল থেকে বিনাশাইল করা হয়েছে বন্যার জন্য, বিনা- ৭ ধান স্বল্প মেয়াদেই ফলন দেবে, বিনা- ৮ ও ১০ লবণাক্তসহনশীল, বিনা- ১১ ও ১৫ ধান জলাবদ্ধ সহনশীল, বিনা- ১৭ তে পানি, সার ও কীটনাশক কম লাগে, বিনা- ১৯ ধান খরাসহিষ্ণু, বিনা- ২০ (লাল চাল) জিংক সমৃদ্ধ, বিনা গম- ১, বিনা সরিষা- ৭, বিনা বাদাম- ৭, ৮, ৯ লবণাক্তসহনশীল। বোরো মৌসুমে অতিরিক্ত পানি লাগে, তাই এখন আউশের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব চাষাবাদের জন্য বিনা ৮ টি জীবাণু সার তৈরি করেছে এবং রেডিয়েশন দিয়ে পোকাকে স্টেরাইল করে জমিতে ছাড়ার জন্য কাজ করছে। এছাড়া



ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। স্থানীয় জাত ও জ্ঞানের লোপ পাওয়ার জন্য আমাদের মানসিকতা দায়ী। একটা সাপ দেখা গেলে, বিষাক্ত হোক বা না হোক, আমরা মেরে ফেলি। এখন এসব ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ছে। মাটির স্বাস্থ্য ও জৈব সারের দিকে বিনা'র নজর আছে। যাতে মনোকালচারের দিকে না যায়, সে কারণে বিনা বিভিন্ন জাতের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এটা সম্প্রসারণে নজর দিতে হবে। জীববৈচিত্র্যের রক্ষায় আইপিএম'র প্রচার করছে। তিনি স্থানীয় জাত ও জ্ঞানের লোপ পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের মানসিকতাকে দায়ী করেন। এখন এসব ব্যবহারে আমাদের সচেতনতা বেড়েছে।

মাটিতে জৈব কার্বনের পরিমাণ বাড়তে হবে

ড. মো. খুরশীদ আলম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকতা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), বলেন, মূলত শহরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে ১৯৬০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা প্রায় ১ ডিগ্রী বেড়ে গেছে। এজন্য কৃষিকেও দায়ী করা হয়, যদিও কৃষির অবদান মাত্র ১৩ শতাংশ। এছাড়া ১৯৬০ সালের পর রাসায়নিক নির্ভর কৃষির ফলে মাটির জৈব উপাদানও আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। মাটির জৈব উপাদান বাড়ানোর প্রযুক্তি আমাদেরকে নিতেই হবে। ইউরিয়া সার ব্যবহারের ফলে বিষাক্ত নাইট্রাস অক্সাইড নির্গত হচ্ছে। সর্বোপরি রাসায়নিক কৃষি উপকরণের জন্য অনেক কার্বন নির্গমন হয়। এসব কিছু মাথায় রেখে সরকার ২০১৬ সালে জাতীয় জৈব কৃষি নীতি প্রণয়ন করেছে। এই পলিসিতে জৈব সারের ব্যবহার ও স্থানীয় প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা রাসায়নিক সারে ভর্তুকী দিই। কিন্তু জৈব চাষের জন্য কোন ভর্তুকীর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যে কৃষক জৈব সার তৈরি করছে সে পৃথিবীর উপকার করছে, তাই তাকে ভর্তুকী বা প্রণোদনা প্রদান করা উচিত বলে আমি মনে করি। ২০১৮ সালের কৃষি নীতিতেও জৈব কৃষি ও পরিবেশ সচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।



ড. মো. খুরশীদ আলম

কেবল মাংসের চিন্তা না, মান সম্পন্ন মাংস ও পুষ্টির নিশ্চয়তা দরকার

ড. মো. রফিকুল ইসলাম, ফোকাল পয়েন্ট ও ডিপিডি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস), বলেন, দেশে প্রতি বছর ৩- ৪ শতাংশ হারে গবাদিপশুর সংখ্যা বাড়ছে। আমরা এখন মাংসে স্বনির্ভর। আমাদের ডিমের চাহিদা প্রায় ১,৬৯৪ কোটি, আর আমরা উৎপাদন করছি প্রায় ১,৪৯৩ কোটি, অর্থাৎ প্রায় কাছাকাছি। দুধের চাহিদা ১৪৮ লাখ মেট্রিক টন, আর উৎপাদন প্রায় ৯৩ লাখ মেট্রিক টন।



ড. মো. রফিকুল ইসলাম

তবে সমস্যা হচ্ছে দুধ বেশি উৎপাদন হলে দাম অনেক কমে যায়, তাই উৎপাদন খরচই পাওয়া যায় না। সকলেরই প্রতিদিন দুধ খাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আমরা খাচ্ছি না। আগে আমাদের ছিল সব দেশী গরু, কিন্তু এখন ১.২০ কোটি প্রজননক্ষম গাভীর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে হাইব্রীড। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও গবেষণার মাধ্যমে এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। গবাদিপশু পালনে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ, বিশেষত লবণাক্ততা, চারণভূমি কমে যাওয়া এবং বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব।



ড. নিলুফার হাই করিম

ড. নিলুফার হাই করিম, সাবেক পরিচালক, (বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইন্সটিটিউট) বলেন, গবেষণার ফল অনুযায়ী মানুষ গড়ে ৫টি উপাদান খাচ্ছে, অথচ, শরীরের জন্যে ১৬টি উপাদান দরকার। মাটির জৈব উপাদানের ব্যাপারে তিনিও উদ্বিগ্ন প্রকাশ করে বলেন, মাটির অনুজীব বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগ

ড. মো. আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), বলেন, আগের থেকে এখন নিম্নচাপের সংখ্যা বেড়েছে। আগে যেখানে বছরে গড়ে ৫/৬ টি নিম্নচাপ দেখা যেত, এখন সেখানে ১২/১৪টি দেখা যায়। ২০১৭ সনে হাওড় এলাকায় বন্যা হলো, পরে শিলাবৃষ্টি হলো, তারপর হলো তাপমাত্রার ওঠানামা। ধানক্ষেতে ব্লাস্ট রোগ দেখা যাচ্ছে। প্রবাহের ফলে বোরো বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন শীতকালের স্বল্পস্থায়ীত্বের কারণে গম চাষের জমির পরিমাণ কমে গেছে (৪ লক্ষ হেক্টর থেকে ৩.১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে নেমেছে)। তবে, ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে (৩.১৩ লক্ষ হেক্টর থেকে ৪.৪৭ লক্ষ হেক্টর জমি)। লবণাক্ত মাটির পরিমাণও বেড়ে গেছে (২৭ লক্ষ হেক্টর থেকে ৩০ লক্ষ হেক্টর)। ফলে, বিরি, বারি, বিনা প্রতিষ্ঠানসমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তি, ও জলবায়ুর তারতম্য (খরা, লবণ, তাপ, শীত) সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করছে। আমরা যেগুলো সম্প্রসারণ করছি। এখন আবহাওয়ার পূর্বাভাস কৃষকদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। জলমগ্ন এলাকার জন্যে ভাসমান বীজতলা ও সবজি চাষের প্রচলন হয়েছে। এখন কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, এবং এগুলোতে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে।



ড. মো. আব্দুস সালাম

ড. মো. সাজ্জাদুর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), বলেন, ব্রি এখন পর্যন্ত ৮৭টি ধানের জাত বের করেছে। আমাদের স্থানীয় জাত অধিকাংশই আমন মৌসুমের। আর জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমন মৌসুম সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এখন ধানের উৎপাদন বোরো থেকে আউশ মৌসুমে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। দেশের উত্তর অঞ্চলে ধান কমিয়ে দক্ষিণ অঞ্চলে ধান বেশি করার জন্য কাজ চলছে। এছাড়া পানি সাশ্রয়ের জন্য অল্টারনেট ওয়েট এন্ড ড্রাইং পদ্ধতি নিয়ে এবং পানি কম লাগে এমন জাত বের করার জন্য কাজ করা হচ্ছে। জৈব উপাদান সরবরাহের জন্য আমাদেরকে ধানের খড় কিছুটা জমিতেই রেখে দিতে হবে। এখন রান্নাঘরের কাঁচা আবর্জনা কিভাবে জমিতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় তা নিয়েও কাজ চলছে। এর পাশাপাশি ইদুর দমনে পেঁচা পালন এবং পোকা দমনের জন্য বাদুড় পালন ও জমির আইলে শেত্র পোকা শিকারী প্রাণী পালন করার গবেষণা চলছে। এখানে জৈব কৃষি নিয়ে কথা হচ্ছে। আমাদের হিসাব করা দরকার জৈব কৃষি করে কতটুকু ফসল উৎপাদন করা যাবে এবং এতে আমাদের চলবে কিনা। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমাদের উপর সবসময়ই চাপ থাকে। তাই বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে বিকল্প প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণায় এগিয়ে আসা দরকার।



ড. মো. সাজ্জাদুর রহমান

মনফিক আহমদ চৌধুরী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) বলেন, আমাদের দেশে প্রতিদিনই অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কৃষিজমি কমে যাচ্ছে, যার হার প্রায় ০.৭২ শতাংশ। কিন্তু আমাদের নিজেদের খাবার নিজেদেরই উৎপাদন করতে হবে, অন্য জায়গা থেকে পাওয়া যাবে না। আবার উফসি ও হাইব্রীড করতে যেয়ে মাটির পুষ্টি কমে যাচ্ছে। এখন কৃষকের কাছে যেয়ে বলতে হবে মাটির অবস্থা জেনে এরপর সুষম সার প্রয়োগ করতে। কোন ফসলের জন্য কোন পুষ্টি দরকার, তার জমির মাটিতে কোন পুষ্টি আছে, এগুলো জেনে সার দিতে হবে। এজন্য মাটি পরীক্ষা করা দরকার। আমাদের প্রতিষ্ঠানের আওতায় মাটি পরীক্ষা



মনফিক আহমদ চৌধুরী

করার জন্য দেশের বৃহত্তর জেলাগুলোতে ১৬টি এবং ১০টি মোবাইল ল্যবরেটরি আছে। এছাড়া সারের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে ৬টি ল্যবরেটরি আছে। কৃষকেরা সরাসরি বা স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের মাধ্যমে মাত্র ৫৮ টাকায় তাদের মাটির পুষ্টি উপাদান পরীক্ষা করতে পারেন এসব জায়গা থেকে।

শস্যের বৈচিত্র্য না থাকলে জীববৈচিত্র্য থাকবে কি?

ড. মো. ফরহাদ হোসেন, অধ্যাপক, শের-এ-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি যেমন আক্রান্ত হয়, তেমনি কৃষির কারণেও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। বিপুল জনগোষ্ঠীকে খাওয়ানোর জন্যে আমরা মনোকালচারের দিকে যাচ্ছি। এই মনোকালচারের কারনেই জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমাদের শস্য বৈচিত্র্য যদি না থাকে তাহলে কিন্তু অন্যান্য জীব বৈচিত্র্যগুলো হারিয়ে যাবে। ইতোমধ্যে গ্রামের স্থানীয় গাছ ও ঝোপ-ঝাড় হারিয়ে গেছে। সুতরাং শস্য বৈচিত্র্য রক্ষায় আমাদের জোর দিতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।



ড. মো. ফরহাদ হোসেন

মাটির উন্নয়নে কয়লার ব্যবহার

ড. তুহিন শুভ্র রায়, অধ্যাপক, শের-এ-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বলেন, তাপ কমাতে কৃষকও ভূমিকা রাখতে পারেন। তাদেরকে প্রযুক্তি সরবরাহ করতে হবে। বাংলাদেশের কৃষক পরিবারগুলো তাদের জমিতে বায়োচার (কয়লা) ব্যবহার করতে পারেন। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকরা লাকড়ি দিয়ে কয়লা বানাতে পারেন বা ব্যবহৃত কয়লাও ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আলু উৎপাদন হয়, কিন্তু গুণগত মানের কারণে আমরা আলু বিদেশে পাঠাতে পারিনা। আলুক্ষেতে বায়োচার ব্যবহার করলে গুণগতমানসম্পন্ন আলু উৎপাদন করা যেতে পারে। অন্যদিকে বোরো ধানের ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার একটা বড় সমস্যা, এক্ষেত্রে এসআরআই বা একফালি চারা রোপণ পদ্ধতির প্রচার করা দরকার।



ড. তুহিন শুভ্র রায়



আনোয়ারা আখতার

আনোয়ারা আখতার, উপ-পরিচালক, পরিবেশ ও কৃষি বনায়ন, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), বলেন, তারা জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি নিয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকেন। সিএসএ (ক্লাইমেন্ট স্মার্ট এগ্রিকালচার) বিষয়ে ৮টি ব্যাচে ২৪০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ড. মো. জহিরউল্লাহ, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), বলেন, দৈনিক খাবারের ৫০ শতাংশ দানা শস্য বা শর্করা (চাল, আটা) খাওয়ার নিয়ম থাকলেও আমরা অনেক বেশি পরিমাণ খাই। দানা শস্য খাওয়া কমিয়ে খাদ্য তালিকায় অন্যান্য শাক- সবজি, ডাল বা মাছ/মাংস/ডিম যুক্ত করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে দৈনিক আমরা যেন অন্তত ছয় ধরনের বা সুসম খাবার গ্রহণ করি। এজন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল চাষাবাদ করতে হবে। আমি মনে করি স্থানীয় শস্যের নানান রকম জাত চাষ করেও এই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। এখন ধানের মধ্যে ভিটামিন-এ যুক্ত করার কথা বলা হচ্ছে, অথচ ১০০ গ্রাম হেলেধণ বা লাল শাক খেলেই একদিনের ভিটামিন-এর চাহিদা পূরণ হয়ে যায়।



ড. মো. জহিরউল্লাহ

মো. হামিদুর রহমান, সাবেক মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলেন, আমরা মানবগোষ্ঠীই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যে দায়ী। আমরা সেটি ইচ্ছাকৃতভাবে করেছি। জলবায়ুর প্রভাব ঠেকাতে আমাদের অভিযোজন দরকার। বাংলাদেশের ১.৫ কোটি কৃষক তাদের ২.২৪ কোটি গবাদি পশু থেকে গোবর সার তৈরি করতে পারেন। শস্যের আবর্তন বজায় রেখে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারেন। বৃক্ষ রোপনের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য বজায় রাখতে হবে।



মো. হামিদুর রহমান

ড. অশোক কুমার ঘোষ, সহযোগী অধ্যাপক, শের-এ-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বলেন, প্রতিবেশগত কৃষি বা জৈব কৃষি লাভজনক কিনা, কিভাবে লাভজনক, সেগুলো কৃষককে বোঝাতে হবে এবং হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।। কিভাবে স্থানীয় জাতের চাষাবাদ বাড়ানো যায় সেদিকে নজর দিতে হবে।



ড. অশোক কুমার ঘোষ



ড. মো. খুরশীদ আলম

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিতে ফেরা যাবে কি?

ড. মো. খুরশীদ আলম বলেন, এখানে জিএমও, জৈব কৃষি, সবই হচ্ছে। আমাদের নীতিতে কোথাও বলা নেই যে, কৃষককে জৈব কৃষিতে বাধ্য করা হবে। কৃষককে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নীতি করা হয়েছে। রিইব'এর মো. ইফতেখার আলী বলেন, আমাদেরকে ভাবতে হবে, আমরা শ্রমঘনিষ্ঠ নাকি পুঁজিঘনিষ্ঠ কৃষি চর্চা করবো। আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে, কৃষিতে কৃষকের মালিকানা বাদ পড়ে যাচ্ছে। তিনি স্থানীয় প্রতিবেশ ব্যবস্থার পুনরুত্থানের উপর জোর দেন।

ড. মাহফুজুল হক, সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার, বলেন, এসব বিষয়গুলো আমাদেরকে নীতি প্রণয়ন ও আলোচনায় নিয়ে আসতে হবে। জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি বা জৈব কৃষির প্রদর্শনে খামার গড়ে তুলতে হবে। প্রচার মাধ্যমকে (যেমন, মাটি ও মানুষ) জৈব কৃষি খামারে নিয়ে আসতে হবে।



ড. মাহফুজুল হক



সাইদুর রহমান

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক রিইব-এর মো. সাইদুর রহমান বলেন, অজৈব কৃষির সাথে জৈব কৃষির তুলনা অসম্ভব। কারণ, প্রথমে হিসেব করতে হবে, রাসায়নিক নির্ভর কৃষিতে কত শত জীব (প্রাণী, অনুজীব, উদ্ভিদ) ধ্বংস হয়ে যায়। এসব প্রাণী, অনুজীব ও উদ্ভিদ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতো। বর্তমান ধারার কৃষিতে মাটি নষ্ট হয়ে গেলে কোথায় ফসল উৎপাদন করা হবে? অবশ্য প্রয়োজনীয় হাজারো উদ্ভিদ ও প্রাণী মারা গেলে তথা বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়ে গেলে মানুষের জীবনব্যবস্থা সংকটাপন্ন হবে।

স্বল্পসময়ের জন্যে সামান্য কিছু ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে মানুষের বর্তমান চাহিদা মেটানো সম্ভব হলেও এই অজৈব কৃষির ফলে মানব ও প্রকৃতির ভবিষ্যত কী হবে?

পূর্বের অভিজ্ঞতা: সুপারিশসমূহ

“ব্যাগিজিকীকরণ ও ভ্রান্ত সমাধান: জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি ও বিকল্পসমূহ”

আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ৯-১১ আগস্ট ২০১৭, ঢাকা।

- কৃষি খাতে ধ্বংসযজ্ঞ এড়ানোর জন্য নীতি ও আইন অন্তর্ভুক্ত করা। কৃষি, ভূমি, জল ও সার নীতি বিষয়ক পর্যবেক্ষণ ও জটিল পর্যালোচনা অত্যাৱশ্যক। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার, সুধি সমাজ, কৃষক এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের যৌথ কর্মসূচী প্রয়োজন।
- বীজ গবেষণা, উৎপাদন, বিক্রয় এবং সামগ্রিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। জলবায়ু অভিযোজিত স্থানীয় বীজের উপযুক্ত সংগ্রহ, বিতরণ এবং তাদের জিনগত বৈচিত্র্য বজায় রাখা দরকার। এসব বৈচিত্র্য ধরে রাখার প্রকৃত পদ্ধতিগুলো প্রসারে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- অধিক উৎপাদনশীলতা ও সহিষ্ণুতার জন্য বিভিন্ন ধরনের উচ্চমানের বীজের শ্রেণীকরণ।
- মাটি ও পানির সঠিক সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা। উপকূলীয় এলাকার মাটি রক্ষাসহ ঐ এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- কৃষি বিষয়গুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- অধিক মাছ চাষের জন্য সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি নিশ্চিত করা।
- ভৌগলিক অবস্থান ভেদে বিশেষায়িত প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক।
- কৃষকের জীবিকা ও আয়, পরিবেশগত প্রভাব এবং জমির গুণগত এবং ফসলের গুণমান বিশ্লেষণ করতে হবে।
- কৃষি ও পরিবেশের ক্ষেত্রে মুনাফানির্ভরতা ও ব্যক্তিগতকরণের ষড়যন্ত্র খুঁজে বের করা অপরিহার্য। সমগ্র কৃষি প্রক্রিয়াকে রাজনীতিকরণ করা।
- কৃষকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং নেতিবাচক রাজনৈতিক অর্থনীতির অবস্থা মোকাবেলা করতে জলবায়ুর স্থিতিস্থাপক কৃষি সমাধানগুলো চিহ্নিত করা।



- কার্বন নির্গমন এবং শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফসলের স্থায়িত্ব বজায় রাখা দরকার। এক্ষেত্রে সিরিয়াল ফসলের উপর নির্ভরতা কমাতে হবে।
- তরল সারের বিকল্প হিসেবে বায়োচার ব্যবহার করা যেতে পারে, যেহেতু কৃষক নিজেই নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে বায়োচার উৎপাদন করতে পারে।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য বায়োফার্টিফাইড শস্য উৎপাদন দরকার। পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা প্রয়োজন। খাদ্যে সার্বভৌমত্ব অর্জনই মূল লক্ষ্য হবে, যেখানে সঠিক বন্টন ও সমন্বয় গুরুত্ব পাবে।
- কৃষি উন্নয়নে উপযুক্ত এবং সংশোধিত তথ্য-উপাত্তের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলোকে গণমানুষের বোধগম্য করে তুলতে হবে। গবেষণার ফলাফল কৃষকদের কাছে পাঠানো আবশ্যিক।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিকল্পগুলো খুঁজে বের করা এবং বাস্তবায়ন করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক দিকগুলো যেগুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে সেগুলোর প্রসার ঘটাতে হবে।
- জলবায়ুভিত্তিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের সহযোগিতা নিশ্চিত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সংযোগগুলোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুসন্ধান করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বয় দরকার।
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, যেমন, কৃষি নীতি, বীজ নীতি, খাদ্য নীতি, পুষ্টি নীতি, জিএমও নীতি, বায়োটেকনোলজি অ্যাক্ট, মৎস্য নীতি, বন নীতি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় বাজেট প্রভৃতি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, সেসব স্থানে প্রতিবেশ-ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব থাকছে কিনা।
- কৃষিখাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবেলার জন্যে আমাদের মাটি, পানি, জীববৈচিত্র্য প্রভৃতি সম্পদকে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।
- কৃষি যেহেতু আমাদের জীবনের উৎস, কাজেই কৃষির সাথে জড়িত মানুষদের সম্মান থাকতে হবে। কৃষকরা যেন তাদের পেশাকে অপ্রত্যাশিত বা অভিশপ্ত মনে না করেন।
- প্রতিবেশগত কৃষির বিকল্প নেই। সেখানে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। জৈব কৃষির প্রদর্শনী খামার গড়ে তুলতে হবে।
- শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। কারণ, এটি মাটি ও

জলরাশিকে দূষিত করেছে।

- কেবল খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে চলবে না, খাদ্যের মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- আমাদের খাদ্য তালিকায় কেবল দানা শস্য নয়, খাদ্যের বৈচিত্র্য দরকার।
- মাটির স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। স্থানীয় উপাদান ও জ্ঞান ব্যবহার করে মাটির জৈব উপাদান, তথা পুষ্টি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।
- কেবল পশুসম্পদ ও মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধিতে নজর দিলে চলবে না। সেগুলোকে কী খাওয়ানো হচ্ছে, সেগুলো মানব স্বাস্থ্যের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ কিনা, সেসব বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে।
- কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।

সংলাপের সমাপনী

সংলাপের সমাপনী অংশে মন্তব্য করেন কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। তিনি বলেন, জলবায়ুর পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের (যেমন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, কার্বন নির্গমন) উত্তর খুঁজতে হবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। কৃষিতে প্রবর্তিত নীতিগুলো অন্যসব নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে কিনা সেটা অনুসন্ধান করতে হবে। জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত সরকারের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব অনেক বড়। সেই সাথে সর্বজনের সচেতন হওয়া দরকার। কৃষিকে আমাদের অস্তিত্বের সমর্থক বলতে হবে। আমাদের মৌলিক সব চাহিদার যোগান কৃষি থেকেই আসে। আমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, কৃষকরা কি কৃষিকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে নিতে পারছে। না পারলে, কেন? রিইব-এর প্রকল্প সমন্বয়ক সুরাইয়া বেগম সভাপ্রধানের বক্তব্যে বলেন, কৃষিতে ভূমির মালিকানা, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়েও আমাদেরকে নজর দিতে হবে।



সক্রিয় আলোচকবৃন্দের তালিকা

ড. লতিফুল বারী	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সাইন্সেস-অ্যানালিসিস অ্যান্ড রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র হেড
ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
ড. মো. খুরশীদ আলম	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
ড. মো. নাজিম উদ্দিন	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি
ড. মো. আব্দুস সালাম	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
ড. মো. সাজ্জাদুর রহমান	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)
মনফিক আহমদ চৌধুরী	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)
ড. মো. ফরহাদ হোসেন	অধ্যাপক, শের-এ-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ড. তুহিন গুপ্ত রায়	অধ্যাপক, শের-এ-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
আনোয়ারা আখতার	উপ-পরিচালক, পরিবেশ ও কৃষি বনায়ন, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
ড. মো. জহির উল্লাহ	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
মো. হামিদুর রহমান	সাবেক মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
সুরাইয়া বেগম	উপ-পরিচালক, রিইব
ড. নীলুফার হাই করিম	সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)
মো. ইফতেখার আলী	অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব
সাইদুর রহমান	কনসালট্যান্ট, রিইব



Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research ("Gonogobeshona") on the development schemes that affect them most, in order to develop ownership and generate community mobilization. For more information please visit www.rib-bangladesh.org



Rosa Luxemburg Stiftung

Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material. For more information please visit www.rosalux.in